هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল হুজুরাত

৪৯

নামকরণ

৪ আয়াতের اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজুরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম-আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসুলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি

www.icsbook.info

না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোন তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোন সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা—এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোন বৈধ ভিত্তি নেই।"

সব শেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়. বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যিকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোন মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

www.icsbook.info

আয়াত ১৮ | সূরা আল হুজুরাত–মাদানী | রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।[১] আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২]

হে মু'মিনগণ ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।[৩] এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ–কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।[৪] যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।[৫] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

১. এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার রব এবং আল্লাহর রসূলকে তার হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনকারী মানে সে যদি তার এ বিশ্বাসে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের মতামত ও ধ্যান–ধারণাকে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, কিংবা বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারে না এবং ঐ সব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ঐ সব ব্যাপারে কোন হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন

www.icsbook.info

কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করবে। কোন মু'মিনের আচরণে এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ বলছেন, "হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" অর্থাৎ তাঁর আগে আগে চলবে না, পেছনে পেছনে চলো। তাঁর অনুগত হয়ে থাকো। এ বাণীতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াতের নির্দেশ থেকে একটু কঠোর। সেখানে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর এখানে বলা হয়েছে ঈমানদারদের নিজেদের বিভিন্ন ব্যাপারে আপনা থেকেই অগ্রগামী হয়ে ফায়সালা না করা উচিত। বরং প্রথমে দেখা উচিত ঐ সব ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতে কি কি নির্দেশনা রয়েছে।

এ নির্দেশটি শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামী আইনের মৌলিক দফা। মুসলমানদের সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহর কিতাব অনুসারে।" নবী (সা) বললেন ঃ যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন্ জিনিসের সাহায্য নেবে ? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেন ঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তাঁর রসূলের কাছে পছন্দনীয়। নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দু'টি উৎসের দিকে ফিরে যাওয়াই এমন একটা জিনিস যা একজন মুসলিম বিচারক এবং একজন অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে। অনুরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত—এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দু'টি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

২. অর্থাৎ যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।

৩. যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল

www.icsbook.info

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

হে নবী ! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হোত।[৬] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭]

নবীর (সা) সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ রাখেন। কারো কণ্ঠ যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাঁকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন সাধারণ মানুষ বা তার সমকক্ষ কাউকে নয় বরং আল্লাহর রসূলকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না।

যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের জন্য এসব আদব-কায়দা শেখানো হয়েছিলো এবং নবীর (সা) যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই নবীর (সা) আলোচনা হবে কিংবা তাঁর কোন নির্দেশ শুনানো হবে অথবা তাঁর হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হবে এরূপ সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের লোকদেরও এ আদব-কায়দাই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সময় কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ আয়াত থেকে সে ইংগিতও পাওয়া যায়। কেউ তার বন্ধুদের সাথে কিংবা সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তার কাছে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সাথেও যদি একইভাবে কথাবার্তা বলে তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর মনে কোন সম্মানবোধ নেই এবং সে তার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

৪. ইসলামে রসূলের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও স্থান কি এ বাণী থেকে তা জানা যায়। কোন ব্যক্তি সম্মানলাভের যতই উপযুক্ত হোক না কেন কোন অবস্থায়ই সে এমন মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তার সাথে বেয়াদবী আল্লাহর কাছে এমন শাস্তিযোগ্য হবে যা মূলত কুফরীর শাস্তি। বড় জোর সেটা বেয়াদবী বা অশিষ্ট আচরণ। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতাও এত বড় গোনাহ যে, তাতে ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নবীর (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল, যিনি তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অবহেলার অর্থ স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি বা অবহেলার পর্যায়ভুক্ত।

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতই তাদের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখে। এ আয়াতাংশ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়

www.icsbook.info

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟
قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ۝٦ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ
رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ
وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ۝٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٨

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[৮]

ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে।[৯] *কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী।*[১০] *আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।*[১১]

যে, যে হৃদয়ে রসূলের মর্যাদাবোধ নেই সে হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া নেই। আর রসূলের সামনে কারো কণ্ঠস্বর উচ্চ হওয়া শুধু একটি বাহ্যিক অশিষ্টতাই নয় বরং অন্তরে তাকওয়া না থাকারই প্রমাণ।

৬. নবীর (সা) পবিত্র যুগে যারা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তারা সবসময় নবীর (সা) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল। এসব ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তাঁর আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ জন্য তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন এবং কখনো যদি তাঁকে

www.icsbook.info

মজলিসে না-ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না। কিন্তু আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিল ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই এবং রাতের বেলা বা দিনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে। আর তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদেরকে সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না। নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো। সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। লোকজনের এ আচরণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে, যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

৭. অর্থাৎ এ যাবত যা হওয়ার তা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা হয় তবে আল্লাহ অতীতের সব ভুল ক্ষমা করে দেবেন এবং যারা তাঁর রসূলকে এভাবে কষ্ট দিয়েছে দয়া ও করুণা পরবশ হয়ে তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না।

৮. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পটভূমি হচ্ছে, বনী মুসতালিক গোত্র মুসলমান হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে যাকাত আদায় করে আনার জন্য ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন। সে তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ খবর শুনে নবী (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মোট কথা, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এ সময়ে বনী মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস ইবনে যেরার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ওয়ালীদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরের কথা তার সাথে আমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। আমরা ঈমানের ওপরে অবিচল আছি এবং যাকাত প্রদানে আদৌ অনিচ্ছুক নই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত

www.icsbook.info

নাযিল হয়। এ ঘটনাটি ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে জারীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে যেরার, মুজাহিদ, কাতাদা, আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, দ্বাহ্হাক এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সুস্পষ্টভাবে ওয়ালীদের নামের উল্লেখ নেই।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের ওপর নির্ভর করার কারণে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাঁচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়াতের একটি নীতি পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্র ও কাজ-কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ হাদীস শাস্ত্রে "জারহ্ ও তা'দীল"-এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসমূহ পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছেছিলো তাদের অবস্থা যাঁচাই বাছাই করতে পারেন। তাছাড়া সাক্ষ আইনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ নীতি নির্ধারণ করেছন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ, আয়াতে نَبَأ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, সাধারণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কারো কাছে গেলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ এসে বললো, আসুন। এ ক্ষেত্রে আপনি তার কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশ করতে পারেন। বাড়ীর মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির সংবাদদাতা সৎ না অসৎ এ ক্ষেত্রে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত, যেসব লোকের ফাসেকী মিথ্যাচার ও চারিত্রিক অসততার পর্যায়ের নয়, বরং আকীদা-বিকৃতির কারণে ফাসেক বলে আখ্যায়িত তাদের সাক্ষ এবং বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু আকীদা খারাপ হওয়া তাদের সাক্ষ ও বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

৯. বনী মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য

www.icsbook.info

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়[১২] তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১৩] তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো।[১৪] যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।[১৫] এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও[১৬] এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[১৭] মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।[১৮] আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

পীড়াপীড়ি করছিলো আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকেও এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় এবং কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন। এ কারণে ঐ সব লোককে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তোমাদের মধ্যে বর্তমান, একথা ভুলে যেয়ো না। তিনি তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়কে তোমাদের চেয়ে অধিক জানেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত মনে হয় তিনি যেন সে অনুসারেই কাজ করেন তোমাদের এরূপ আশা করাটা অত্যন্ত অন্যায় দুঃসাহস। যদি তোমাদের কথা অনুসারে সব কাজ করা হতে থাকে তাহলে বহু ক্ষেত্রে এমন সব ভুল-ত্রুটি হবে যার ভোগান্তি তোমাদেরকেই পোহাতে হবে।

১০. অর্থাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচালনা করতে চাচ্ছিলো। তাদের এ চিন্তা ছিল ভুল। তবে মু'মিনদের গোটা জামায়াত এ ভুল করেনি। মু'মিনদের সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচার-আচরণকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর আচরণকে তাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এ আয়াতের দু'টি অংশে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ আয়াতাংশে সব

www.icsbook.info

সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়নি, বরং যারা বনী মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো সে বিশেষ কিছু সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। আর وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ আয়াতাংশে সমস্ত সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করার দুঃসাহস কখনো দেখাতেন না। বরং ঈমানের দাবী অনুসারে তাঁর হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে সবসময় আনুগত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। এর দ্বারা আবার একথা বুঝায় না যে, যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। একথা থেকে যে বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঈমানের এ দাবীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে শিথিলতা এসে পড়েছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে এ ভুল ও এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং পরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নীতির অনুসারী সেটিই সঠিক নীতি ও আচরণ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন অযৌক্তিক ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়। তিনি যাকেই এ বিরাট নিয়ামত দান করেন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন এবং নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যাকে এর উপযুক্ত বলে জানেন তাকেই দান করেন।

১২. আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সে ক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটা চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

১৩. এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষকে লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত

www.icsbook.info

করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

১৪. অর্থাৎ এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু' পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য। এটা সেই ফিতনার অন্তরভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ القائم فيها خير من الماشى والقاعد فيها خير من القائم (সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।) কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু' পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোটা খিলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেন ঃ

ما وجدت فى نفسى من شيئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى - (المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة ، باب الدفع عمن قعدوا عن بيعة على)

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"

সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার

www.icsbook.info

বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালংঘন নিরসন করতে সক্ষম।

১৫. এ থেকে বুঝা যায়, এ যুদ্ধ বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী দল)–কে বিদ্রোহের (সীমালংঘনের) শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুসারে যা ন্যায় বিদ্রোহী দল তা মেনে নিতে উদ্যোগী হবে এবং সত্যের এ মানদণ্ড অনুসারে যে কর্মপন্থাটি সীমালংঘন বলে সাব্যস্ত হবে তা পরিত্যাগ করবে। কোন বিদ্রোহী দল যখনই এ নির্দেশ অনুসরণ করতে সম্মত হবে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ, এটিই এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে–ই সীমালংঘনকারী। এখন কথা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে কোন বিবাদে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি তা নির্ধারণ করা নিসন্দেহে তাদেরই কাজ যারা এ উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে বিষয়টি বিচার–বিশ্লেষণ করার যোগ্য।

১৬. শুধু সন্ধি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সন্ধি করিয়ে দেয়ার। এ থেকে বুঝা যায় হক ও বাতিলের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে সন্ধি করানো হয় এবং যেখানে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী দলকে অবদমিত করে সীমালংঘনকারী দলকে অন্যায়ভাবে সুবিধা প্রদান করানো হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। সে সন্ধিই সঠিক যা ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের সন্ধি দ্বারা বিপর্যয় দূরীভূত হয়। তা না হলে ন্যায়ের অনুসারীদের অবদমিত করা এবং সীমালংঘনকারীদের সাহস ও উৎসাহ যোগানোর অনিবার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, অকল্যাণের মূল কারণসমূহ যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এমনকি তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা থেকে বার বার বিপর্যয় সৃষ্টির ঘটনা ঘটতে থাকে।

১৭. এ আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদীস (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিধানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ, নবীর (সা) যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মত কোন ঘটনাই কখনো সংঘটিত হয়নি যে, তাঁর কাজ ও কথা থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলীর (রা) খিলাফত যুগে যখন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দেয়া হয়। তখন যেহেতু বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্তমান ছিলেন তাই তাদের কর্মকাণ্ড ও বর্ণিত আদেশ থেকে ইসলামী বিধানের এ শাখার বিস্তারিত নিয়ম–কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। নিচে আমরা এ বিধানের একটি প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছি ঃ

www.icsbook.info

এক ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটি ধরন হতে পারে এবং প্রতিটি ধরন সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বিভিন্ন ঃ

(ক) যুদ্ধরত দু'টি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া কিংবা তাদের মধ্যে কোন্ দলটি সীমালংঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যখন দু'টি বড় শক্তিশালী দল হবে কিংবা দু'টি মুসলিম সরকার হবে এবং উভয়ে পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই চালাবে তখন মু'মিনদের কাজ হলো এ ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকা।

(গ) যুদ্ধরত যে দু'টি পক্ষের কথা ওপরে (খ) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি পক্ষ যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং আপোষ মীমাংসায় রাজী না হয় সে ক্ষেত্রে ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষ অবলম্বন করা।

(ঘ) উভয় পক্ষের একটি পক্ষ যদি প্রজা হয় আর তারা সরকার অর্থাৎ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী এ দলকেই তাদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

দুই ঃ বিদ্রোহী অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীও নানা রকম হতে পারে ঃ

(ক) যারা শুধু হাংগামা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। এ বিদ্রোহের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন শরীয়াতসম্মত কারণ নেই। এ ধরনের দল ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মত মতে বৈধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সরকার ন্যায়বান হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

(খ) যেসব বিদ্রোহী সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু এ জন্য তাদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন যুক্তি নেই। বরং তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা জালেম ও ফাসিক। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে সমর্থন করা বিনা বাক্য ব্যয়ে ওয়াজিব। কিন্তু সে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ নাও হয় তবুও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করা ওয়াজিব। কারণ সেই সরকারের জন্যই রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা টিকে আছে।

(গ) যারা নতুন কোন শরয়ী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং আকীদা ফাসেদ; যেমন, খারেজীদের আকীদা ও ব্যাখ্যা। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধ অধিকার আছে। সে সরকার ন্যায়নিষ্ঠ হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আর এ সরকারকে সমর্থন করাও ওয়াজিব।

(ঘ) যারা এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার প্রধানের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধভাবে কায়েম হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে শরীয়াতসম্মত কোন

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা থাক বা না থাক সরকারের সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ এবং তাদের সমর্থন করা ওয়াজিব।

(৬) যারা এমন একটি জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যার নেতৃত্ব জোর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার নেতৃবৃন্দ ফাসেক। কিন্তু বিদ্রোহকারীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও প্রতিভাত হচ্ছে যে, তারা সৎ ও নেক্‌কার। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' অর্থাৎ সীমালংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়েছে। এ মতবিরোধের বিষয়টি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ এবং আহলে হাদীসদের মত হচ্ছে, যে নেতার নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তাঁর নেতৃত্ব যেভাবেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। তবে তিনি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। ইমাম সারাখসী লিখছেন ঃ মুসলমানগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে ও পথঘাট নিরাপদ হয় এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কোন দল বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। (আল মাবসূত, খাওয়ারেজ অধ্যায়) ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেন ঃ নেতা অর্থাৎ মুসলিম শাসকবৃন্দ জালেম এবং ফাসেক হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে ইমাম নববী দাবী করেছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবী করা ঠিক নয়। মুসলিম ফিকাহ্‌বিদদের একটি বড় দল যার মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত অন্তরভুক্ত বিদ্রোহকারীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জালেম ও ফাসেক নেতাদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেক্‌কার লোকদের অবাধ্যতাকে তারা কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুসারে বিদ্রোহের নামান্তর বলে আখ্যায়িত করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব বলেও মনে করেন না। অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতামত বিষয়ে জ্ঞানীগণ সম্যক অবহিত। আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম সাহেব এ যুদ্ধকে শুধু জায়েযই মনে করতেন না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহে তিনি যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)। মনসূরের বিরুদ্ধে নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে তিনি পুরাপুরি সক্রিয়ভাবে নাফসে যাকিয়াকে সাহায্য করেছেন। সেই যুদ্ধকে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; মানাকেবে আবী হানীফা, আল কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

৭১-৭২) তাছাড়াও ইমাম সারাখসী যে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন তা হানাফী ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত নয়। হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে ইবনে হুমাম লিখছেন ঃ

الباغى فى عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق

"সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে বিদ্রোহী সে-ই যে ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।"

হাম্বলীদের ইবনে আকীল ও ইবনুল জুযী ন্যায়নিষ্ট নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (আল ইনসাফ, ১০ খণ্ড, বাবু কিতালি আহলিল বাগী) ইমাম শাফেয়ী তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫) মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদ্রোহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭) কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তাকে ঐ অবস্থাই ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা অপর কোন জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং তৃতীয় কোন জালেম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দেবেন। তিনি ইমাম মালেকের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে এক শাসকের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে থাকলে তার ভাইও যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করা হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হয়। আমাদের সময়ের ইমাম বা নেতাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কোন বাইয়াত বা আনুগত্য শপথই নেই। কারণ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের পক্ষে শপথ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাহনুনের বরাত দিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী উলামাদের যে রায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের সহযোগিতার জন্যই করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বাইয়াতকৃত ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। দু' জনের কেউই যদি ন্যায়নিষ্ঠ না হয় তাহলে দু'জনের থেকেই দূরে থাকো। তবে যদি তোমার নিজের জীবনের ওপর হামলা হয় কিংবা মুসলমানগণ জুলুমের শিকার হয় তাহলে প্রতিরোধ করো। এ মত উদ্ধৃত করার পর কাজী আবু বকর বলেন ঃ

لانقاتل الامع امام عادل يقدمه اهل الحق لانفسهم

"সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে ছাড়া আর কারো জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না।"

তিন ঃ বিদ্রোহীরা যদি স্বল্প সংখ্যক হয়, কোন বড় দল তাদের পৃষ্ঠপোষক না থাকে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বেশী না থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ

www.icsbook.info

তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে কিসাস গহণ করা হবে এবং আর্থিক ক্ষতি সাধন করে থাকলে জরিমানা অদায় করা হবে। যেসব বিদ্রোহী কোন বড় রকমের শক্তির অধিকারী এবং অধিকতর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বিদ্রোহ করবে বিদ্রোহ বিষয়ক আইন কানুন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

চার ঃ বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শুধু তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস অথবা সরকার ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা যাবে না। যখন তারা কার্যত সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। (আল মাবসূত—বাবুল খাওয়ারিজ, ফাতহুল কাদীর—বাবুল বুগাত, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

পাঁচ ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হবে। তাদের যদি কোন সন্দেহ-সংশয় এবং প্রশ্ন থাকে তাহলে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু করা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

ছয় ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাকেম, বায্‌যার ও আল জাস্‌সাস বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে উম্মে আবদের পুত্র, এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না। এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ও কর্ম সমস্ত ফিকাহ্‌বিদ এ উক্তি ও আমলের ওপর নির্ভর করেছেন। উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করো না, আহতদের আক্রমণ করো না, বন্দীদের হত্যা করো না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান করো, মানুষের বাড়ীঘরে প্রবেশ করো না এবং গালি দিতে থাকলেও কোন নারীর ওপর হাত তুলবে না। হযরত আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবী করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দাস বানিয়ে বন্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলী (রা) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশাকে তার নিজের অংশে নিতে চাও?

সাত ঃ হযরত আলীর (রা) অনুসৃত নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়ীতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ

www.icsbook.info

শেষ হলে এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না এবং পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশংকা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করবেন। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস)।

আট ঃ পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। (আল মাবসূত)

নয় ঃ নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কারণ তা মৃতদেহ বিকৃতকরণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ রোমান ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। (আল মাবসূত)

দশ ঃ যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও অশান্তি পুনরায় যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন সম্পদের জন্য তাদের জরিমানাও করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছিলো। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

এগার ঃ যেসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে তারা নিজেদের প্রশাসন চালু করে যাকাত এবং সরকারী কর ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে, সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনর্দখলের পর জনগণের কাছে পুনরায় উক্ত যাকাত ও কর দাবী করবে না। বিদ্রোহীরা যদি উক্ত অর্থ শরীয়াতসম্মত পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে আদায়কারীদের পক্ষ থেকে তা আল্লাহর কাছেও আদায়কৃত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি উক্ত সম্পদ শরীয়াতসম্মত নয় এমন পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে তা প্রদানকারী এবং আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। তারা চাইলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে পারে। (ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস—ইবনুল আরাবী)।

বার ঃ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরীয়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তা বহাল রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফায়সালা যদি শরীয়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা ওয়ারেন্ট বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস)

www.icsbook.info

তের ঃ ইসলামী আদালতসমূহে বিদ্রোহীদের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফাসেকীর অন্তরভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু একবার তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে আমি আর তাদের সাক্ষ গ্রহণ করবো না। (আল জাস্‌সাস)

এসব বিধান থেকে মুসলমান বিদ্রোহী এবং কাফের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনে পার্থক্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৮. এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাইয়াত" নিয়েছেন। এক, নামায কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান) মুসনাদে আহমাদে হযরত সাঈদ ইবনে মালেক ও তার পিতা থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" (মুসলিম—কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী—আবওয়াবুল বিরর ওয়াস্‌সিলাহ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী নবীর (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ইমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত।

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

২ রুকূ'

হে[১৯] ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।[২০] তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করোনা[২১] এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না।[২২] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার।[২৩] যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে নবীর (সা) এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইঁটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। (বুখারী—কিতাবুল আদাব, তিরমিযী—কিতাবুল বির্‌র-ওয়াস্ সিলাহ)

১৯. পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানির অভিযোগ পেশ করে নিজের মর্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ

www.icsbook.info